পুরুষতন্ত্র এবং নারীত্বের পুনর্পাঠ : জেন্ডার বোঝাপড়ায় পরিবার ও রাষ্ট্র

জোবাইদা নাসরীন

প্রেক্ষাপট

গত মাসে বনানীর এক হোটেলে দুই নারী ধর্ষণের ঘটনায় জেগে উঠেছিল বাংলাদেশ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্যাতন-নিপীড়নমূলক বিষয় নিয়ে সামাজিক প্রতিবাদের অস্থায়ী ভিত্তি তৈরি হয়, যার মেয়াদ হয়ত থাকে সর্বোচ্চ ১৫ দিন। বাংলাদেশের মানুষের এরকম জেগে ওঠার রোমান্টিকতা বেশ পুরোনো। আমি এই প্রবন্ধে এটাকে ইচ্ছে করেই বলছি প্রতিবাদের 'রোমান্টিকতা'। গত এক বছর আগেও তনু হত্যাকে কেন্দ্র করে মানুষ জেগে উঠেছিল, আবার ঘুমিয়েও পড়েছিল। এরপরে ছিল রাজন হত্যা। কিছুদিন সব জায়গাতেই প্রতিবাদ ও মানববন্ধন চলে। তারপর থেমে যায়। সামাজিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি নজরদারিও বাড়ে এবং সেগুলোও ঘটনাকেন্দ্রিক। বাড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিসিটিভি ক্যামরার স্থায়ী ও অস্থায়ী বসতি, বাড়ে ব্যাগসমেত কিংবা ব্যাগবিহীন মানুষকে যন্ত্র দ্বারা ব্যবচ্ছেদ। এই সবই আমরা জানি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা বা স্ক্যানিং মেশিনে দেখা যায় না কয়দিন পরেই কেন আমাদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়!

রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা পরিবারের ঘটনাকেন্দ্রিক এই জেগে ওঠা এবং থেমে যাওয়ার সামাজিক মতাদর্শিক অর্থনীতি কী? কেনই-বা এই জেগে ওঠাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনাকেন্দ্রিক হয়? কারণ অপরাধের মতাদর্শিক প্রতিরোধের মানসিকতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের মধ্যে নেই। আমরা এটিকে জীবনযাপনের রাজনীতির সাথে যুক্ত করে দেখি না। জীবনকে ব্যক্তিগত খাতায় জমা দিয়ে আমরা অরাজনৈতিক জীব হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব সাজাতে থাকি। আর এই 'অরাজনৈতিক' ব্যক্তি যখন একটি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নড়াচড়া করে, তখন সেটি তার প্রতিবাদী মেজাজের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারলেও মতাদর্শিক টানাপোড়েনে ঝুলতে থাকে; যার কারণে এগুলোকে আমরা খুবই বিচ্ছিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নির্যাতন হিসেবে দেখি। তাই শুধু ঘটনা ঘটলেই আমরা আওয়াজ দেই। আর এভাবেই আমাদের প্রতিনিয়ত জিইয়ে রাখা এই অরাজনৈতিক চর্চা অপরাধপ্রবণতাকে উস্কে দেয়। কীভাবে আমাদের প্রতিদিনকার 'অরাজনৈতিক' সত্তা অপরাধকে সংস্কৃতিতে পরিণত করতে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে তা একবারের জন্যও ভেবে দেখি না।

নজরদারির রাজনীতি বনাম মতাদর্শিক রাজনীতি নিয়ে কাজের এবং দেখার পরিধি অসীমায়িত থাকলেও শুধু জেন্ডার বিষয়ক ব্যক্তিসত্তার নড়াচড়া এবং এর প্রতিবাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় জায়গা। তাই সংগত কারণেই পরিবার এবং এর লৈঙ্গিক গাঁথুনি এবং এর অনুবাদ এই আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লৈঙ্গিক রাজনীতির একপেশে পরিবর্তন এবং চিন্তাজাগতিক পক্ষপাতিত্ব লৈঙ্গিক রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় পরিবর্তন আনলেও তা ঘটে পুরুষ এবং পুরুষতান্ত্রিক সম্পর্কের বোঝাপড়ায় কোনো ধরনের অভিঘাত তৈরি না করেই। অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই বলা যায় যে, বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই গত

দশক থেকে লৈঙ্গিক রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে এক ধরনের 'ইতিবাচক' পার্থক্য এসেছে। সমাজের কাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট ছকের খোলস ভেঙে নারী তার জন্য সামাজিকভাবে নির্ধারিত সীমানাকে অসীম করেছে। তাই সমকালীন লিঙ্গীয় পরিচিতির ডিসকোর্স বিশ্লেষণে নারীর কাঙ্ক্ষিত চরিত্র হিসেবে 'টমবয়' যেমন আদৃত, তেমনি 'মেয়েলিপনা'ও গ্রহণযোগ্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতকে চিন্তাধারায় যুক্ত রেখেই আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধের ঝোঁক একেবারেই সুনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে : প্রথমত, সমাজ এবং সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিবার কীভাবে গৎবাঁধা বা 'প্রথাগত' চিন্তার বাইরে গিয়ে লিঙ্গীয় চিরায়তমনস্কতার বাইরে রাজনৈতিক সত্তার চর্চা করবে এবং ঘটনাকেন্দ্রিক নয় বরং প্রতিদিনকার জীবনযাপনে রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে তার প্রতিফলন ঘটাবে। পরিবার এবং সামাজিক পরিসরে অরাজনৈতিক সত্তা কীভাবে ভয়ের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত থাকে সেটি বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় ঝোঁক। প্রবন্ধের সর্বশেষ ঝোঁক কীভাবে এই অরাজনৈতিক আচরণ অপরাধের পুনরুৎপাদনকে উৎসাহিত করে। খুব যৌক্তিকভাবেই তাই এই প্রবন্ধের প্রথম জায়গা হলো পরিবারের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সত্তার অনুপস্থিতি কিংবা আংশিক উপস্থিতি যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং নারী নিপীড়নের বিষয়গুলোকে মতাদর্শিকভাবে হাজির করে না এবং যে কারণে এগুলো প্রতিদিনকার রাজনীতির অংশ হয় না তা বিশ্লেষণ করা।

নারীকেন্দ্রিক জেন্ডার সচেতনতার প্যাকেজ

একটা সময় ছিল যখন পরিবারে জন্মের পর থেকেই লৈঙ্গিক রাজনীতির মধ্যে সন্তানকে বড়ো করা হতো। অর্থাৎ পরিবারেই একটি শিশুকে শেখানো হতো সে ছেলে না মেয়ে। মেয়েশিশুকে বার্বি পুতুল আর ছেলেশিশুকে গাড়ি দিয়ে লিঙ্গীয় জগতে প্রবেশ করানোর মনস্কতাই ছিল একভাবে প্রবল। বর্তমানে এই ধারণায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে। তবে সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে যে লিঙ্গীয় পক্ষপাতের চর্চা হয়, এবং তার মাধ্যমে যে সম-রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না, আমরা এই প্রবন্ধে সেটিই আলোচনা করব।

সনাতনের বাইরে পরিবর্তিত মূল্যবোধ থেকেই আমরা মেয়েদের চিরায়ত বিষয়ের বিরুদ্ধে তাদের স্বপ্ন সফল করতে শেখাই। কিন্তু একইভাবে একই বিষয়ে আমরা ছেলেকে শিখাই না। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ক্যারিয়ার নির্বাচনে কিংবা লিঙ্গের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনে আমরা বর্তমানে নারীদের প্রথাগত পছন্দের বাইরের অনেক ধরনকেও জায়গা দিচ্ছি, কিন্তু তা করা হচ্ছে পুরুষের পৃথিবীকে সীমিত রেখেই। নারীসুলভতার প্রতি তাদের আগ্রহকে অনুৎসাহিত করা হয় এবং তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় পুরুষের নারীসুলভতা এখনো কাঙ্ক্ষিত নয়। যে কারণে নারীর শার্ট-প্যান্ট পরাটাকে খুব পজিটিভভাবে নেওয়া হলেও পুরুষের নারীর পোশাক পারাটা কেউ হাল ফ্যাশন হিসেবে নেবার চিন্তা করে না। নারী শুধু সন্তান ধারণ করবে আর পুরুষ অন্য সকল সৃষ্টিশীল কাজের সাথে যুক্ত হবে। প্রকৃতি বনাম সংস্কৃতির এই প্রথাবদ্ধ চর্চাকে বর্তমানে নারীর উপস্থাপন চ্যালেঞ্জ করছে। যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই সমতাভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে চাই, তাহলে ছেলেদের আরো অনেক পছন্দের তালিকা দেওয়া দরকার। গ্লোরিয়া স্ট্রেইনমেইন বলেন যে, আমরা খুশি যে আমরা আমাদের মেয়েদের ছেলেদের মতো করে তৈরি করছি, কিন্তু আমরা আমাদের ছেলেদের মেয়েদের মতো তৈরি করছি না। তাই পুরুষের পৃথিবী পরিবর্তন না করে নারীর ভূমিকা কখনো বাড়ানো যাবে না।

আমরা ছেলেদের স্কুল পরীক্ষায় অকৃতকার্যতাকে নিয়ে চিন্তিত হই এবং প্রতিবছর নারীরা যে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে সেটি নিয়ে গর্ববোধ করি। কিন্তু এই রেজাল্টের লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ দাঁড় করাই না। এর

বিপরীতে কেন ছেলেরা এই নতুন গোলাপী অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়ছে সেটি দেখছি না। বর্তমানে নতুন গোলাপী অর্থনীতির মূল জায়গা হলো সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং যত্ন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এগুলোকে নারীসুলভভাবে দেখা হয়। আর এ কারণেই পুরুষের কাছ থেকে এগুলো কখনো আশা করা যায় না। কিন্তু এগুলো ছাড়া এখন আর শিল্প কারখানাগুলো দ্রুত উন্নয়ন সাধন করতে পারে না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় জানা যায় যে, ছেলে ও মেয়েরা ছোট বয়সে সমান কান্না করে। পাঁচ বছর বয়সে ছেলেসন্তানরা এই তথ্য পায় যে, তাদের রাগ আদৃত হবে কিন্তু তারা তাদের নাজুকতাজনিত অনুভূতির প্রকাশ একবারেই করতে পারবে না। কারণ এটি মেয়েলি বিষয়। আমাদের মেয়েদের সংবেদনশীল হতে ইঙ্গিত দিই, কিন্তু বিপরীতে ছেলের কাছে রোবোটিক মেজাজ আশা করি। আমরা কথায় কথায় বলি, ছেলেটি মেয়েদের থেকেও মনের দিক থেকে নরম কিংবা মেয়েদের মতো কথায় কথায় কাঁদে। নরমত্বের উপমা হয়ে ওঠে নারীর মন।

ছেলেদের কাঁদতে দাও

আমরা ছেলেদের জন্য ছেলে রোল মডেলের উদাহরণ দিই কিন্তু কখনো মেয়ে রোল মডেলের উদাহরণ দিই না। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের জানতে দিই না কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা পথপ্রদর্শক হয়েছে। ছোট সন্তানেরা কোনো ক্ষেত্রেই এই ধরনের পছন্দ বা অপছন্দ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমরা এও জানি যে, মধ্য বিশশতকেও গোলাপী ছেলেদের এবং নীল মেয়েদের রং ছিল। কীভাবে বছর পঞ্চাশের মধ্যে এর প্রতীকী উপস্থাপন পুরোপরি ভিন্ন হয়ে গেল, সেই বিষয়টি আমরা বিশ্লেষণ করি না। পরিবারে সন্তানদের সীমিত করা নয় বরং তাদের আগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সাম্প্রতিক সময়ে অভিভাবকরা একজন মেয়েকে নিয়ে ফুটবল খেলোয়াড় কিংবা ভালো সাঁতারু হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন, কিন্তু কোনোভাবেই একজন ছেলেকে নার্স হিসেবে দেখতে চান না। কারণ এটি মেয়েসুলভ চাকুরি বলে কথিত। যার কারণে আমাদের ছোটবেলায় দেখা পুরুষ নার্সের তুলনায় বাংলাদেশে এখন পুরুষ নার্সের সংখ্যা খুবই কম। একজন নারীর পাইলট হিসেবে ক্যারিয়ার তৈরি করাকে আমরা যেভাবে চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে উপস্থাপন করি, সেই হিসেবে একজন পুরুষের কাঁথা সেলাই করাকে চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে দেখতে চাই না। চ্যালেঞ্জ কিন্তু উভয়ের জন্য সমান।

সমাজ একটি মেয়েকে এবং ছেলেকে যে যে পেশায় দেখতে চায়, তার বিপরীতে কেউ যদি পেশা গ্রহণ করে, তার জন্য সেটাই চ্যালেঞ্জ। কিন্তু পুরুষের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কখনো পত্রিকায় কিংবা অন্যান্য মিডিয়ায় আসে না। যে কারণে একটি মেয়ের এবং তার সমপর্যায়ের কারো প্রথাগত 'নারীত্ব' থেকে বের হয়ে আসা (যেমন মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরে, ছোট চুল রাখে) বা/ও সেটিকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা যেভাবে লিঙ্গীয় সমতাকে মাপি, আসলে ঘটনা ঘটে একেবারেই বিপরীত। পুরুষ এসব চর্চা এবং বাতচিতের বাইরে থাকায় পুরুষের লম্বা চুল কম-বেশি গ্রহণ করা হলেও পুরুষের নারীদের পোশাক পরা এখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

নিজের এবং অন্যের যত্ন নেওয়ার কাজে পুরুষদের যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'নারীরা সুপার ওমেন'— এই জাতীয় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নারীর প্রশংসা করা হয়। এতে নারীর ক্ষমতার স্তুতি করা হয় মাত্র। কিন্তু এটি একভাবে নতুন ঢংকে উসকে দেওয়া লিঙ্গীয় অসমতাকেই জিইয়ে রাখে। পুরুষের মধ্যে সহমর্মিতা এবং সযত্ন কাজের আগ্রহ তাকে নারী করে তোলার চেয়ে মানুষ হিসেবে তৈরি করবে। ছেলেদের এই বিষয়টি এরকমভাবে বলা মানে এই নয় যে এটি শুধু ছেলেদের বলা। এটি লৈঙ্গিক পার্থক্য ঘুচাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছেলেদের তাদের আবেগ লুকানো নয়, বরং কীভাবে পরিবারের যত্ন নিতে হয় তা শেখাতে হবে। কীভাবে এগুলো অমান্য করতে কঠোর হতে হয় সেটিও তাদের জানাতে হবে। তাদেরকে তাদের আগ্রহ এবং উৎসাহের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়াও শেখাতে হবে।

স্কুলে ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তান একে অন্যকে ধরাটা 'ওরা বোঝে না' জাতীয় বাক্যের মধ্য দিয়ে সীমিত না রেখে অন্যকে সম্মান এবং শ্রদ্ধার বোধের মাধ্যমে বলতে হবে। 'ছেলেরা সব সময়ই ছেলে'— এটি পুরুষের কোনো বাজে আচরণের অজুহাত হতে পারে না। বরং এর মধ্য দিয়ে পুরুষের সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিকতার অবিচ্ছেদ্যতাকে প্রমাণ করা হয়। 'তুমি মেয়েদের মতো দৌড়াও অথবা হাঁটো কিংবা মেয়েদের মতো কথা বলো'— এ ধরনের বক্তব্য রাখার অভ্যাস থেকে ছেলেদের দূরে রাখা ভালো। ছেলেমেয়ে উভয়ের সাথেই ছোটবেলা থেকেই কোনো ধরনের যৌনতামাশা করা ঠিক নয়। মায়েরা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন বেশি। গৎবাঁধা লৈঙ্গিক রাজনীতি নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা

বলা দরকার সবচেয়ে বেশি। কারণ তাদের জানতে ও জানাতে হবে। যদি তিন বছর বয়স থেকেই গৎবাঁধা লৈঙ্গিক রাজনীতি নিয়ে তাদের ধাক্কা না দেওয়া যায়, তাহলে আজকে তারা যে রূপে আছে সে রূপেই থাকবে। যে কারণে একজন মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই ধর্ষণ এবং নিপীড়ন বিষয়ে যে পরিমাণ তটস্থ রাখা হয় এবং তার ওপর যে পরিমাণ পারিবারিক নজরদারি থাকে, ছেলেটির ওপর সেটি থাকে না। ফলে ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই ভাবতে শুরু করে ধর্ষণ কিংবা নারী নিপীড়ন একটি নারী ইস্যু এবং এটি নিয়ে নারীই সবসময় চিন্তিত থাকবে এবং তারাই এটিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবে।

প্রতিবাদের রোমান্টিকতা ও ভয়ের সংস্কৃতি

আমরা কেন এক একটি 'ঘটনা'র পর সবাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি? নিশ্চয়ই এর প্রধান কারণ আমাদের মেনে না নেওয়ার মানসিক দৃঢ়তা। প্রতি বছর সব না হলেও প্রায় চার পাঁচটি 'ঘটনা'কে নিয়ে আমরা আলোচনায় মাতি, ব্যথিত হই। শাস্তির দাবিতে রোদ-বৃষ্টি কিংবা শীত উপেক্ষা করেও মানববন্ধন, মিছিল, সমাবেশ করি। অবশ্য এই ঘটনাগুলো নির্বাচনেও কিছু ক্যাটাগরি আছে; যেমন, 'ঘটনা'র শিকার নারী যদি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত কিংবা বিখ্যাত কেউ হন, তাহলে সেটি নিয়ে আলোচনা বেশি হয়। আবার অপরাধের হোতাও যদি বিখ্যাত কেউ হয় অথবা এই ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্র যদি নেতিবাচকভাবে নড়াচড়া করে তাহলে তখনো প্রতিবাদ বেশি হয়। এই প্রতিবাদের ধরন এবং পাটাতনগুলো মানবিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সামগ্রিক শক্তির প্রচার আমাদের অনেককেই নিয়ে যায় মিছিলে কিংবা প্রতিবাদের অন্য পাটাতনগুলোতে; যেটা হয়ত একজন ব্যক্তির পক্ষে একা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেক সময়ই। কারণ ব্যক্তির প্রথম ভয় পরিবার, দ্বিতীয় ভয় সমাজ এবং তৃতীয় ভয়ের উৎস রাষ্ট্র।

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নারীকে চ্যালেঞ্জ ভাঙা শেখানো হচ্ছে কিন্তু পারিবারিকভাবে প্রতিবাদমুখর হিসেবে তাদের কমই তৈরি করা হয়। অন্যদিকে একজন ছেলেকে নারী ইস্যুতে প্রতিবাদী হওয়া ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় না। কারণ সেটি এখনো আমাদের দেশের 'সংস্কৃতি' হয়ে উঠতে পারে নি। তাই অন্যের সাথে প্রতিবাদে যাওয়াটাই অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

দ্বিতীয় ভয় সমাজের। সমাজে একটি মেয়েকে এখন বিভিন্ন পেশায় দেখে মানুষের চোখ ও মনের অভ্যস্ততা তৈরি হলেও প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে দেখে অভ্যস্ততা তৈরি হয় নি। যার কারণে নারী ইস্যুকেন্দ্রিক ঘটনায় পুরুষের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণও সামাজিকভাবে অতটা স্থায়ী সচেতনতার পাটাতন তৈরি করতে পারে নি। যে কারণে আজ থেকে তেইশ বছর আগে ইয়াসমীন ধর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে দিনাজপুরে সাতজন প্রতিবাদী পুরুষ আত্মাহুতি দিলেও সেই জায়গাটিতে মতাদর্শিক প্রলেপ পড়ে নি। যে কারণে মতাদর্শিক জায়গা থেকে লিঙ্গীয় বোঝাপড়ার এই টানাপোড়েন প্রভাব ফেলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দেনদরবারে।

এই ভয়ের সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী? রাষ্ট্রের আইনের প্রথম ভিত্তি থানা। নারী ধর্ষণ কিংবা যৌন হয়রানিজনিত বিষয় নিয়ে থানায় মামলা করতে যেতে ভয় পায়। থানা সম্পর্কে লোকজনের আস্থার পরিবর্তে ভয়ের বিষয় কাজ করে। সেখানে হয়রানি, অসংবেদনশীল আচরণ এবং পরে 'টু ফিঙ্গার টেস্টের যন্ত্রণা', ধর্ষণ মামলার প্রক্রিয়াজনিত চাপ তার মধ্যে পুনরায় ভয় তৈরি করে। আমাদের প্রতিবাদমুখরতা এই প্রক্রিয়াগুলোকে সংবেদনশীল করার ক্ষেত্রে খুব কমই ভূমিকা রাখে। তাই যখন ১৫/২০ দিন পর প্রতিবাদ থেমে যায়, তখন একমাত্র 'ঘটনা'র শিকার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সেটি বহন করে না কিংবা সেটি

কারো কাছেই আর আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন ঘটনা জন্ম নেওয়ায় প্রতিবাদকারীরা সেই দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের লিঙ্গীয় সমতার প্যাকেজের অন্যতম হচ্ছে নারীকে সচেতন করা। বেশিরভাগ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নারীকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুব কম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পুরুষকে। যার কারণে বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জেন্ডার শব্দটির অনুবাদ হয় নারী। যে কারণে অনেক পুরুষই জেন্ডার বিষয়ে কথা বলতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আশপাশের মানুষ তাকে 'নারী' বলে খ্যাপাতে পারে এই ভয়ে।

পরিবার এবং রাষ্ট্রের বন্ধন

আমরা রাজনৈতিক এককে লিঙ্গীয় ভাবনাচিন্তায় নতুন ধারণা নিয়ে পরিবারের মতাদর্শিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেটি কীভাবে আবার পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শকেই উৎপাদন করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, নারী-পুরুষের সমসম্পর্কের যে রাজনৈতিক চর্চা পরিবার থেকে চর্চিত হওয়ার কথা সেটি হচ্ছে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মতাদর্শিক রাজনৈতিক পরিসরের বদল না হওয়ায় বারবারই একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। যে কারণে একজন নারীর নিরাপত্তা নিয়ে পরিবার চিন্তিত থাকে। তারা তাকে ঘরে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ফলে ছোটবেলা থেকেই তাকে নিরাপত্তার বলয়ে রাখা হয়। তাকে প্রতিদিন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সে নিরাপদ নয়। কিন্তু তার পাশাপাশি যে কারণে তার এই অনিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়, তাকে মানে ছেলেকে কোনো ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমনকি ছেলেসন্তানটির লিঙ্গীয় রাজনীতি কিংবা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের কারণে কী কী নির্যাতনের পরিসর তৈরি হতে পারে, সেই বিষয়েও তার কোনো ধরনের সচেতনতা তৈরি করা হয় না।

পরিবারের ছেলেটি কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে, কী করছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে পরিবারের উদাসীনতা সমাজে আদৃত। এর পাশাপাশি 'বরই গাছ থাকলে সবাই ঢিল দিবে' জাতীয় প্রবাদের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিদিনই পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতিকে উৎসাহ দিয়ে চলছি। রাস্তাঘাটে নারীর প্রতি যৌন হয়রানিমূলক বাক্য ছুড়ে দেওয়াকেও এই সংস্কৃতির অংশ মনে করা হয়। গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, প্রায় ৯২ শতাংশ পুরুষই নারীকে দেখে শিস বাজানো, নারীর শরীরকেন্দ্রিক মন্তব্য করা এবং পাবলিক পরিসরে নারীর প্রতি যৌন হয়রানিকে অপরাধ মনে করে না। যার মধ্য দিয়ে এই ধরনের চর্চাকে, পুরুষতান্ত্রিকতাকে সংস্কৃতি হিসেবে ধরে নিয়ে এর ক্ষমতাজনিত অপরাধকে বৈধতা দেওয়া হয়। যে কারণে বনানীর ধর্ষকদের একজন খুবই দম্ভের সাথে বলে যে, সে ধর্ষণকে অপরাধ মনে করে না। আর তারও একধাপ উপরে ছিল সেই ধর্ষকের বাবার বক্তব্য। এ সবই আমাদের জানা।

'মেয়েরা স্বভাবতই শান্ত হয় এবং ছেলেরা একটু দুষ্টু প্রকৃতির হয়'— এই মতাদর্শীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষান্তরে ছোটবেলা থেকেই ছেলেটির পৌরুষদীপ্ততাকে সমর্থন জোগায়। ছোটবেলার দুষ্টুমির বাহবা বা মারধরের পারদর্শিতাকে আমরা সাহস হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা তাকে নিয়ে কোনো টেনশন করি না। আমাদের পরিবারেই আমাদের সাথে বড়ো হওয়া আদরের ভাইটি ঘরের বাইরে অন্য নারীর প্রতি কী আচরণ করছে আমরা তা জানি না। কিংবা জানলেও 'আমার ভাই এটা করতে পারে না' জাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করি। কিন্তু আমরা কখনো মনে করতে পারি না যে, ভাইটির সাথে তার আচরণসংক্রান্ত বিষয়ে

ছোটবেলা থেকে কোনো কথা বলেছি কি না। পরিবারের ছেলেটিকে মতাদর্শিক আচরণ শেখানোর আমাদের এই অনভ্যস্ততাই নারীর প্রতি অসম্মান এবং ধর্ষণের ঝোঁক তৈরি করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই পরিণতি হিসেবেই আমাদের মনোজগতে এখনো ধর্ষণ নারী ইস্যু। তাই আমরা আশা করি, নারী এবং নারী সংগঠনগুলোই কেবল এর প্রতিবাদ করবে। নারীকেই তার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের চারপাশে এই মানসিকতার মানুষেরই প্রাধান্য। তাই এরকম জরুরি বিষয়ে পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে চলমান অন্যমনস্কতা ধর্ষণের মতো অপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অতি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধকেও 'ঘটনা'কেন্দ্রিক অবস্থায় নিয়ে যায়। আর তখনই পুরষতান্ত্রিকতার পরিসরে বড়ো হওয়া নারীরাও প্রশ্ন তোলেন, মেয়েগুলো অত রাতে কেন হোটেলে গেল? পুলিশকে কেন সাথে সাথে না জানিয়ে কিছুদিন পরে জানানো হলো? এই বয়সে ছেলেরা একটু আধটু এরকম করেই! মেয়েগুলোর নিশ্চয়ই রাতে বাইরে থাকার অভ্যাস আছে— এই জাতীয় লেবেলের মধ্য দিয়ে তাদের ওপর এক ধরনের আরোপিত সামাজিক নজরদারি তৈরি করা হয়।

পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারি কীভাবে নারীর ওপরই প্রযোজ্য হয়, এ বিষয় নিয়েই এই অংশের আলোচনা। এ ধরনের 'ঘটনা' ঘটলে তখন পরিবারগুলো নারীর ওপর নজরদারি আরোপ করে। রাষ্ট্র বিভিন্ন উৎসব এবং অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় নারীর চলাফেরার সময় বেঁধে দেয়। নারী ঘটনার দিন না করে কেন কয়েকদিন পরে মামলা করল সেটি নিয়ে বাহাস তৈরি করে ধর্ষণের আলামত খুঁজতে গিয়ে তার যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ে গালগল্প তৈরি করে। নারীর শরীর থেকে শুরু করে তার চলাচল সব বিষয়ে নজরদারি বাড়িয়ে দেয়। খুবই আগ্রহব্যঞ্জক বিষয় হলো, নারীর পছন্দের জায়গা উন্মুক্ত রেখে পরিবার এবং রাষ্ট্র তাদের লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা প্রকাশ করলেও ধর্ষণ কিংবা যৌন হয়রানির ক্ষেত্রেও আবার আলোচনায় আসে নারীর পরনে কী পোশাক ছিল, রাতের বেলায় জন্মদিনের পার্টিতে কেন গেল, ইত্যাদি প্রশ্ন। সুতরাং নারীর ওপর নিপীড়নকারী এবং নিপীড়নের ফাঁক-ফোকর নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে এখানেও টার্গেট করা হয় নারীকেই।

উপসংহার

এখন সামাজিক মাধ্যম অনেক বেশি শক্তিশালী। এর মাধ্যমে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারছে সবকিছু। যার কারণে জানার সাথে সাথে তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সচলতা অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রেও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। লিঙ্গীয় নির্যাতনের কারখানাগুলোকে মতাদর্শিকভাবে না নেওয়ায় এর চর্চার ঘাটতি দেখা যায় প্রতিরোধের সংস্কৃতির ওপরও। একেকটি ঘটনা ঘটে আমরা ফেসবুক-টুইটারে প্রতিক্রিয়া দেখাই, মানববন্ধন কিংবা মিছিল করি। এটির স্থায়িত্ব বড়োজোর ১০-১২ দিন। তারপর আমরা সেটা ভুলে যাই। কারণ এটা একটা ঘটনাকেন্দ্রিক প্রতিবাদ। সেই নির্যাতনের ক্ষত মন থেকে মুছে গেলে আমরাও সরে যাই, যেহেতু আমরা এটাকে আমাদের প্রতিদিনকার যাপিত জীবনের অ্যাজেন্ডা হিসেবে দেখি না।

আমরা পারিবারিকভাবে সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দিই, ইংরেজি-বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিই, কিন্তু তাদের সঙ্গে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কে কথা বলতে আমরা খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। যে কারণে পরিবার থেকে এ বিষয়ে কোনো ধরনের মতাদর্শিক পাটাতন তৈরি হয় না। সেই

মতাদর্শিক নির্দেশনা না নিয়েই আমরা বড়ো হই। 'শান্ত-দুষ্টু' খেতাব নিয়ে বড়ো হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা আর এই একদা খেতাব পাওয়া 'দুষ্টু' ছেলেটিই কখন যে ধীরে ধীরে ধর্ষক হয়ে ওঠে, তা বাবা-মা জানতেও পারেন না। কিংবা জানলে-বুঝলেও বয়সের 'দুষ্টুমি' হিসেবে বৈধতা দিয়ে দেন।

আমরা মনে করি, ছেলেসন্তানের বাবা-মায়ের দায়িত্ব বেশি। কাজেই সমাজের এবং পরিবারের কাছে অতি কাঙ্ক্ষিতভাবে জন্ম নেওয়া আমাদের ছেলেসন্তানটি কোনো নারীকে আক্রান্ত করছে কি না, সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরই। ছোটবেলা থেকেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ, নারীকে নির্যাতন না করা বিষয়ে তাকে পরিবারিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়াও দরকার। মেয়েটির নিরাপত্তার চেয়ে জরুরি দরকার ছেলেটির মনস্কতার পরিবর্তন। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে জেন্ডার আলোচনা ও বোঝাপড়ায় শুধু নারীকে টার্গেট করলে হবে না। নারী চ্যালেঞ্জিং (তার নারীসুলভ কাজের বাইরে) কাজ করলে আমরা যেমন বাহবা দেব, তেমনি পুরুষও তার গৎবাঁধা পুরুষালি ডিসকোর্স থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের চোখে চ্যালেঞ্জিং কাজ করলে (সমাজের কাছে প্রত্যাশিত নারীসুলভ কাজ) সেটিকেও সমানভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হওয়া খুব দরকার।

ড. জোবাইদা নাসরীন সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
zobaidanasreen@gmail.com